

নবী কাহিনীঃ (১২তম)- ২য় পর্ব হযরত ইউসুফ আ

আসসালামু'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

ইউসুফ মিসরের অর্থমন্ত্রীর গৃহে

অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ব্যবসায়ী কাফেলা তাকে বিক্রির জন্য মিসরের বাজারে উপস্থিত করল। মানুষ কেনা-বেচার সেই হাটে এই অনিন্দ্য সুন্দর বালককে দেখে বড় বড় ধনশালী খরিদাররা রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাকে মর্যাদার স্থানে সমুল্লত করতে চেয়েছিলেন। তাই সব খরিদারকে ডিঙিয়ে মিসরের তৎকালীন অর্থ ও রাজস্বমন্ত্রী ক্বিৎফীর **قطيفير** তাকে বহুমূল্য দিয়ে খরিদ করে নিলেন। ক্বিৎফীর ছিলেন নিঃসন্তান।

মিসরের অর্থমন্ত্রীর উপাধি ছিল ‘আযীয’ বা ‘আযীয মিছর’। ইউসুফকে ক্রয় করে এনে তিনি তাকে স্বীয় স্ত্রীর হাতে সমর্পণ করলেন এবং বললেন, একে সন্তানের ন্যায় উত্তম রূপে লালন-পালন কর। এর থাকার জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। ভবিষ্যতে সে আমাদের কল্যাণে আসবে’। বস্তুতঃ ইউসুফের কমনীয় চেহারা ও নম্র-ভদ্র ব্যবহারে তাদের মধ্যে সন্তানের মমতা জেগে ওঠে। ক্বিৎফীর তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে ইউসুফের মধ্যে ভবিষ্যতের অশেষ কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন। আর সেজন্য তাকে সর্বোত্তম যত্ন সহকারে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। মূলতঃ এসবই ছিল আল্লাহর পূর্ব-নির্ধারিত। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপঃ

‘মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানজনকভাবে থাকার ব্যবস্থা কর। সম্ভবতঃ সে আমাদের কল্যাণে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এভাবে আমরা ইউসুফকে সেদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এজন্যে যে তাকে আমরা বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ স্বীয় কর্মে সর্বদা বিজয়ী। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ (ইউসুফ ১২/২১)।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন (**أفرس الناس ثلاثة**)। একজন হ’লেন ‘আযীযে মিছর’ (যিনি ইউসুফের চেহারা দেখেই তাঁকে চিনেছিলেন)।

দ্বিতীয় শো‘আয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মূসা (আঃ) সম্পর্কে স্বীয় পিতাকে বলেছিল, হে পিতা! আপনি ঐকে আপনার কর্মসহযোগী হিসাবে রেখে দিন। কেননা উত্তম সহযোগী সেই-ই, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়’ (ক্বাছাছ ২৮/২৬)।

তৃতীয় হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, যিনি ওমর ফারুককে পরবর্তী খলীফা নিয়োগ করেছিলেন’। ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/১৮

এ পর্যন্ত হযরত ইউসুফের জীবন গড়ে উঠেছিল বিজন মরু প্রান্তরে আধা যাযাবর ও পশু পালকদের পরিবেশে। কেনান ও উত্তর আরব এলাকায় সে সময় কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল না এবং সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতি তেমন কোন ধরনের উন্নতি লাভ করেনি। সেখানে ছিল কিছু সংখ্যক স্বাধীন উপজাতির বাস। তারা মাঝে মাঝে এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করতো। আবার কোন কোন উপজাতি বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে নিজেদের ছোট ছোট রাষ্ট্রও গঠন করে নিয়েছিল। মিসরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী এসব লোকের অবস্থা ছিল প্রায় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত স্বাধীন পাঠান উপজাতিদের মতো।

এখানে হযরত ইউসুফ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাতে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল বেদুইন জীবনের সৎগুণাবলী এবং ইবরাহিমী পরিবারের আল্লাহমুখী জীবন চিন্তা ও ধর্মচর্চা। কিন্তু মহান আল্লাহ সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য ও উন্নত দেশ অর্থাৎ মিসরে তাঁর মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাচ্ছিলেন এবং এ জন্য যে পর্যায়ের জানাশোনা, অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ সাধনের কোন সুযোগ বেদুইন জীবনে ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতাবলে তাঁকে মিসর রাজ্যের একজন বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে তাঁকে নিজের গৃহ ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করলেন। এভাবে ইতিপূর্বে তাঁর যেসব যোগ্যতাকে কোন কাজে লাগানো হয়নি তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়ে গেলো। ছোট্ট একটি জমিদারী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগামীতে একটি বড় রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। এ আয়াতে এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বাইবেলে এ ব্যক্তির নাম লেখা হয়েছে “পোটিফর”। সামনের দিকে গিয়ে কুরআন মজীদ একে “আযীয” নামে উল্লেখ করেছে। তারপর আবার এক জায়গায় হযরত ইউসুফের জন্যও এ উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন মিসরের কোন বড় অফিসার অথবা পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। কারণ “আযীয” মানে হচ্ছে এমন কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা যেতে পারে না। বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাদশাহর রক্ষক সেনাপতি (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান)। ইবনে জারীর হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাজকীয় অর্থ বিভাগের প্রধান।

ইউসুফ যৌবনে পদার্পণ করলেন

আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল, সে তার স্ত্রীকে বললঃ এর থাকার সম্মানজনক ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে বা আমরা একে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি। আর এভাবেই আমরা ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; এবং যাতে আমরা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ইউসুফঃ২১

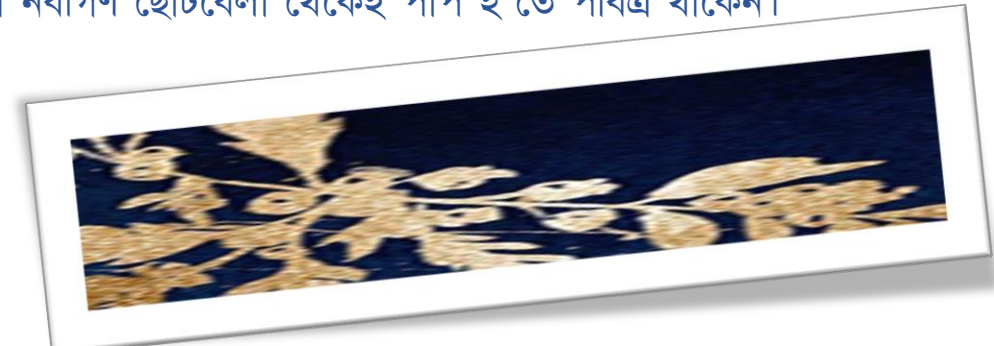
আযীযে মিছরের গৃহে কয়েক বছর পুত্র স্নেহে লালিত পালিত হয়ে ইউসুফ অতঃপর যৌবনে পদার্পণ করলেন। আল্লাহ বলেন,

(۲۲) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ - (يوسف)

‘অতঃপর যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি’ (ইউসুফ ১২/২২)।

উক্ত আয়াতে দু’টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি এবং প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করা। সকলে এ বিষয়ে একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি লাভের অর্থ হ’ল নবুঅত লাভ করা। আর সেটা সাধারণতঃ চল্লিশ বছর বয়সে হয়ে থাকে। অন্যদিকে পূর্ণ যৌবন লাভ তার পূর্বেই হয়। যা বিশ বছর থেকে ত্রিশ বা তেত্রিশের মধ্যে হয়ে থাকে। হযরত ইবনু আববাস, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ প্রমুখ বিদ্বান তেত্রিশ বছর বলেছেন এবং যাহহাক বিশ বছর বলেছেন। যাহহাক সম্ভবতঃ প্রথম যৌবন এবং ইবনু আববাস পূর্ণ যৌবনের কথা বলেছেন।

এক্ষণে ইউসুফের প্রতি যুলায়খার আসক্তির ঘটনা নবুঅত লাভের পূর্বের না পরের, এ বিষয়ে বিদ্বানগণ একমত নন। আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, যদিও যৌবন ও নবুঅতের কথা একই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তথাপি ঘটনা একই সময়ের নয়। নবুঅত তিনি চল্লিশ বছর বয়সেই পেয়েছেন ধরে নিলে যুলায়খার ঘটনা অবশ্যই তার পূর্বে তার পূর্ণ যৌবনেই ঘটেছে। কারণ ঐ সময় ইউসুফের রূপ-লাবণ্য নিশ্চয়ই শৈশবের ও প্রৌঢ় বয়সের চাইতে বেশী ছিল, যা যুলায়খার ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। অথচ ইউসুফের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা নবীগণ ছোটবেলা থেকেই পাপ হ’তে পবিত্র থাকেন।



যৌবনের মহা পরীক্ষায় ইউসুফ

রূপ-লাবণ্যে ভরা ইউসুফের প্রতি মন্ত্রীপত্নী যুলায়খার অন্যায় আকর্ষণ জেগে উঠলো। সে ইউসুফকে খারাপ ইঙ্গিত দিতে লাগল। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

‘আর সে যে মহিলার বাড়ীতে থাকত, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং (একদিন) দরজা সমূহ বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাছে এসো! ইউসুফ বলল, আল্লাহ আমাকে রক্ষা করুন! তিনি আমার মনিব। তিনি আমার উত্তম বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই সীমা লংঘনকারীগণ সফলকাম হয় না’ (২৩)।

‘উক্ত মহিলা তার বিষয়ে কুচিন্তা করেছিল এবং ইউসুফ তার প্রতি (অনিচ্ছাকৃত) কল্পনা করেছিল। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করত’ (অর্থাৎ আল্লাহ নির্ধারিত উপদেশদাতা ‘নফসে লাউয়ামাহ’ তথা শাণিত বিবেক যদি তাকে কঠোরভাবে বাধা না দিত)। এভাবেই এটা এজন্য হয়েছে যাতে আমরা তার থেকে যাবতীয় মন্দ ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয়ই সে আমাদের মনোনীত বান্দাগণের একজন’ (২৪)।

‘তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি ইউসুফের জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার মুখে পেল। তখন মহিলাটি তাকে বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অন্যায় বাসনা করে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা (অন্য কোন) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ব্যতীত আর কি সাজা হ’তে পারে’? (২৫)।

‘ইউসুফ বলল, সেই-ই আমাকে (তার কুমতলব সিদ্ধ করার জন্য) ফুসলিয়েছে। তখন মহিলার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফের জামা সামনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহ’লে মহিলা সত্য কথা বলেছে এবং ইউসুফ মিথ্যাবাদী’ (২৬)।

‘আর যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়, তবে মহিলা মিথ্যা বলেছে এবং ইউসুফ সত্যবাদী’ (২৭)।

আয়াতে আছে “বুরহান।” বুরহান মানে দলীল বা প্রমাণ। রবের প্রমাণ মানে রবের দেখিয়ে দেয়া বা বুঝিয়ে দেয়া এমন প্রমাণ যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের (আ) বিবেক ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, এ নারীর ভোগের আহ্বানে সাড়া দেয়া তাঁর পক্ষে শোভনীয় নয়। এ প্রমাণটি কি ছিল? ইতিপূর্বে পিছনের বাক্যেই তা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছেঃ “আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন আর আমি খারাপ কাজ করবো! এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।” এ অকাট্য যুক্তিই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সদ্যোন্মিত যৌবনকালের এ সংকট সন্ধিক্ষণে পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। তারপর বলা হলো, “ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি তা তাঁর রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।” এ থেকে নবীগণের নিষ্পাপ হবার (ইস্মাতে আস্থিয়া) তত্ত্বের অর্ন্তনিহিত সত্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর নিষ্পাপ হবার মানে এ নয় যে, তাঁর গুনাহ, ভুল ও ত্রুটি করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। বরং এর মানে হচ্ছে, নবী যদিও গুনাহ করার শক্তি রাখেন কিন্তু সমস্ত মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া এবং যাবতীয় মানবিক আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা-প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সদাচারী ও আল্লাহ ভীরু হয়ে থাকেন যে, জেনে বুঝে কখনো গুনাহ করার ইচ্ছা করেন না। তাঁর বিবেকের অভ্যন্তরে আল্লাহর এমন সব শক্তিশালী দলীল প্রমাণ তিনি রাখেন যেগুলোর মোকাবিলায় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা কখনো সফলকাম হবার সুযোগ পায় না। আর যদি সজ্ঞানে তিনি কোন ত্রুটি করেই বসেন তাহলে মহান আল্লাহ তখনই সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্বলন শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পদস্বলন নয় বরং সমগ্র উম্মতের পদস্বলনের রূপ নেয়। তিনি সঠিক পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে মাইলের পর মাইল চলে যায়।

এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি।

দু’টি অর্থ হতে পারে। এক, তাঁর রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমি নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে এবং এটি অত্যন্ত গভীর অর্থবোধক যে, ইউসুফের সাথে এই যে ব্যাপারটি ঘটে গেলো এটি আসলে তাঁর প্রশিক্ষণ পর্বের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় ছিল। তাঁকে অসৎ প্রবণতা ও অশ্লীলতা মুক্ত করার এবং তাঁর আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল যে, তাঁর সামনে গুনাহের এমনি একটি সংকটময় পরিস্থিতি আসুক এবং সেই পরীক্ষার সময় তিনি নিজের সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতির পাল্লায় রেখে দিয়ে নিজের নফসের অসৎ প্রবণতাগুলোকে চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত করুন। বিশেষ করে তদানীন্তন মিসরীয় সমাজে যে নৈতিক পরিবেশ বিরাজিত ছিল তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে এ বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

মহিলাদের সমাবেশে ইউসুফ

গৃহস্বামী দু'জনকে নিরস্ত করে ঘটনা চেপে যেতে বললেও ঘটনা চেপে থাকেনি। বরং নানা ডাল-পালা গজিয়ে শহরময় বাষ্ট্র হয়ে গেল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় পুত্রসম গোলামের সাথে অন্যায় কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তখন বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য যুলায়খা শহরের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের নিজ বাড়ীতে ভোজসভায় দাওয়াত দেবার মনস্থ করল। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা নিম্নরূপঃ

‘নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে অন্যায় কাজে ফুসলিয়েছে। সে তার প্রতি আসক্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রষ্টতার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি’ (৩০)। ‘যখন সে (অর্থাৎ যুলায়খা) তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন তাদের জন্য একটা ভোজসভার আয়োজন করল এবং (ফল কাটার জন্য) তাদের প্রত্যেককে একটা করে চাকু দিল। অতঃপর ইউসুফকে বলল, এদের সামনে চলে এস। (সেমতে ইউসুফ সেখানে এল) অতঃপর যখন তারা তাকে স্বচক্ষে দেখল, তখন সবাই হতভম্ব হয়ে গেল এবং (ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের অজান্তে) স্ব স্ব হাত কেটে ফেলল। (ইউসুফের সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তারা) বলে উঠল, হায় আল্লাহ! এ তো মানুষ নয়। এ যে মর্যাদাবান ফেরেশতা!’ (৩১)।

‘(মহিলাদের এই অবস্থা দেখে উৎসাহিত হয়ে) যুলায়খা বলে উঠল, এই হ’ল সেই যুবক, যার জন্য তোমরা আমাকে ভৎসনা করেছ। আমি তাকে প্ররোচিত করেছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে সংযত রেখেছে। এক্ষণে আমি তাকে যা আদেশ দেই, তা যদি সে পালন না করে, তাহ’লে সে অবশ্যই কারাগারে নিষ্কিণ্ড হবে এবং সে অবশ্যই লাঞ্চিত হবে’ (ইউসুফ ১২/৩০-৩২)।

উপরোক্ত আয়াতে যুলায়খার প্রকাশ্য দস্তোজ্বি থেকে বুঝা যায় যে, উপস্থিত মহিলারাও ইউসুফের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং যুলায়খার কুপ্রস্তাবের সাথে তারাও ঐক্যমত পোষণ করে। যা ইউসুফের প্রার্থনায় বহুবচন ব্যবহার করায় বুঝা যায়। যেমন এই কঠিন পরীক্ষার সময়ে ইউসুফ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন,

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ- فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ- (يوسف ৩৩-৩৪)

‘হে আমার পালনকর্তা! এরা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার নিকটে অধিক পসন্দনীয়। (হে আল্লাহ!) যদি তুমি এদের চক্রান্তকে আমার থেকে ফিরিয়ে না নাও, তবে আমি (হয়ত) তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব’। ‘অতঃপর তার পালনকর্তা তার প্রার্থনা কবুল করলেন ও তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (ইউসুফ ১২/৩৩-৩৪)।

শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাদের নিজ বাড়ীতে জমা করে তাদের সামনে যুলায়খার নিজের লাম্পট্যকে প্রকাশ্যে বর্ণনার মাধ্যমে একথাও অনুমিত হয় যে, সে সময়কার মিসরীয় সমাজে বেহায়াপনা ও ব্যভিচার ব্যাপকতর ছিল।

নবীগণ নিষ্পাপ মানুষ ছিলেন

ইউসুফের প্রার্থনায় ‘আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব’ কথার মধ্যে এ সত্য ফুটে উঠেছে যে, নবীগণ মানুষ ছিলেন এবং মনুষ্যসুলভ স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের মধ্যেও ছিল। তবে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থায় তাঁরা যাবতীয় কবীরা গোনাহ হ’তে মুক্ত থাকেন এবং নিষ্পাপ থাকেন। বেগানা নারী ও পুরুষের মাঝে চৌম্বিক আকর্ষণ এটা আল্লাহ সৃষ্ট প্রবণতা, যা অপরিহার্য। ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহ এই প্রবণতা ও ক্ষমতা সৃষ্টি করেননি। তাই তারা এসব থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে কুদসীতে বলেন, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ফেরেশতামন্ডলীকে বলেন, আমার বান্দা যখন কোন সৎকর্মের আকাংখা করে, তখন তার ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটা নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। আর যদি পাপকাজটি সে করেই ফেলে, তবে একটির বদলে একটি গোনাহ লিপিবদ্ধ কর’।[]

অতএব ইউসুফ-এর অন্তরে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির আশংকাটি কেবল ধারণার পর্যায়ে ছিল। সেটা ছগীরা বা কবীরা কোনরূপ গোনাহের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিঃসন্দেহে ইউসুফ ছিলেন নির্দোষ ও নিষ্পাপ এবং পূত চরিত্রের যুবক।

[] . বুখারী হা/৬১২৬ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায় ৩১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/১৩১ ‘ঈমান’ অধ্যায় ৬১ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬৩ ‘মি‘রাজ’ অনুচ্ছেদ।



ইউসুফ জেলে গেলেন

শহরের বিশিষ্ট মহিলাদের সমাবেশে যুলায়খা নির্লজ্জভাবে বলেছিল, 'ইউসুফ হয় আমার ইচ্ছা পূরণ করবে, নয় জেলে যাবে'। অন্য মহিলারাও যুলায়খাকে সমর্থন করেছিল। এতে বুঝা যায় যে, সে যুগে নারী স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা চরমে উঠেছিল। তাদের চক্রান্তের কাছে পুরুষেরা অসহায় ছিল। নইলে স্ত্রীর দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেও মন্ত্রী তার স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার সাহস না করে নির্দোষ ইউসুফকে জেলে পাঠালেন কেন? অবশ্য লোকজনের মুখ বন্ধ করার জন্য ও নিজের ঘর রক্ষার জন্যও এটা হ'তে পারে।

ইউসুফ যখন বুঝলেন যে, এই মহিলাদের চক্রান্ত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় নেই, তখন তিনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন, আল্লাহ এরা আমাকে যে কাজে আহ্বান করছে, তার চেয়ে কারাগারই আমার জন্য শ্রেয়:। আল্লাহ তার দো'আ কবুল করলেন এবং তাদের চক্রান্তকে হটিয়ে দিলেন (ইউসুফ ১২/৩৩-৩৪)।

এতে বুঝা যায় যে, চক্রান্তটা একপক্ষীয় ছিল এবং তাতে ইউসুফের লেশমাত্র সম্পৃক্ততা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ ইউসুফ যদি জেলখানাকে 'অধিকতর পসন্দনীয়' না বলতেন এবং শুধুমাত্র আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, তাহ'লে হয়তবা আল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তার অন্য কোন ব্যবস্থা করতেন। যাইহোক আযীয়ে মিছরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করে ইউসুফ যুলায়খার হুমকি মতে জেলখানাকেই অধিকতর শ্রেয়: বলেন। ফলে কারাগারই তার জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফকে বাঁচানোর জন্য কৌশল করলেন। 'আযীয়ে মিছর' ও তার সভাসদগণের মধ্যে ইউসুফের সততা ও সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল। তথাপি লোকজনের কানা-ঘুসা বন্ধ করার জন্য এবং সর্বোপরি নিজের ঘর রক্ষা করার জন্য ইউসুফকে কিছুদিনের জন্য কারাগারে আবদ্ধ রাখাকেই তারা সমীচীন মনে করলেন এবং সেমতে ইউসুফ জেলে প্রেরিত হলেন।

যেমন আল্লাহ বলেন, **ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنُنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ -**

'অতঃপর এসব (সততার) নিদর্শন দেখার পর তারা (আযীয়ে মিছর ও তার সাথীরা) তাকে (ইউসুফকে) কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল' (ইউসুফ ১২/৩৫)।

কারাগারের জীবন

বালাখানা থেকে জেলখানায় নিষ্ক্ষিপ্ত হওয়ার পর এক করুণ অভিজ্ঞতা শুরু হ'ল ইউসুফের জীবনে। মনোকষ্ট ও দৈহিক কষ্ট, সাথে সাথে স্নেহাঙ্ক ফুফু ও সন্তানহারা পাগলপরা বৃদ্ধ পিতাকে কেন'আনে ফেলে আসার মানসিক কষ্ট সব মিলিয়ে ইউসুফের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। কেন'আনে ভাইয়েরা শত্রু, মিসরে যুলায়খা শত্রু। নিরাপদ আশ্রয় কোথাও নেই। অতএব জেলখানাকেই আপাতত: জীবনসাথী করে নিলেন এবং নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করে কয়েদী সাথীদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতে মনোনিবেশ করলেন। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইউসুফকে আল্লাহ স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন (ইউসুফ ১২/৬)। দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও তাঁর জন্য সহায়ক প্রমাণিত হয়।

জেলখানার সাথীদের নিকটে ইউসুফের দাওয়াত

ইউসুফ কারাগারে পৌঁছলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত যুবক কারাগারে প্রবেশ করে। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্য পান করাতো এবং অপরজন বাদশাহর বাবুর্চি ছিল।

ইবনু কাছীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লেখেন যে, তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশানোর দায়ে অভিযুক্ত হয়ে জেলে আসে। তখনও মামলার তদন্ত চলছিল এবং চূড়ান্ত রায় বাকী ছিল। তারা জেলে এসে ইউসুফের সততা, বিশ্বস্ততা, ইবাদতগুয়ারী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে। তখন তারা তাঁর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়।

বন্ধুত্বের এই সুযোগকে ইউসুফ তাওহীদের দাওয়াতে কাজে লাগান। তাতে প্রতীতি জন্মে যে, সম্ভবতঃ কারাগারেই ইউসুফকে 'নবুঅত' দান করা হয়। ইউসুফের কারা সঙ্গীদ্বয় এবং তাদের নিকটে প্রদত্ত দাওয়াতের বিবরণ আল্লাহ দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে:

‘ইউসুফের সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিঙড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখলাম যে, আমি মাথায় করে রুটি বহন করছি। আর তা থেকে পাখি খেয়ে নিচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। কেননা আমরা আপনাকে সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি’ (৩৬)। ‘ইউসুফ বলল, তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দান করা হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন। আমি ঐসব লোকদের ধর্ম ত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে’ (৩৭)। ‘আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না’ (ইউসুফ ১২/৩৬-৩৮)।

অতঃপর তিনি সাথীদের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে বলেন,

‘হে কারাগারের সাথীদ্বয়! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ’? ‘তোমরা আল্লাহ্ কে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের পূজা করে থাক। যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এদের পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ (ইউসুফ ১২/৩৯-৪০)।

এভাবে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পর তিনি স্বীয় কারা সাথীদ্বয়ের প্রশ্নের জওয়াব দিতে শুরু করলেন।-

‘হে কারাগারের সাথীদ্বয়! তোমাদের একজন তার মনিবকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শূলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি (ঘিলু) খেয়ে নিবে। তোমরা যে বিষয়ে জানতে আগ্রহী, তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে’। ‘অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে (অর্থাৎ বাদশাহর কাছে) আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে আমাকে মুক্তি দেয়)। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হ’ল’ (ইউসুফ ১২/৪১-৪২)।

ইউসুফের দাওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(১) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের পরিচয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা আবশ্যিক। যাতে শ্রোতার মনে কোনরূপ দ্বৈত চিন্তা ঘর না করে। ইউসুফ তাঁর দাওয়াতের শুরুতেই বলে দিয়েছেন যে, আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না এবং আখেরাতে জবাবদিহিতায় বিশ্বাস করে না’ (ইউসুফ ১২/৩৭)।

(২) দাওয়াত দেওয়ার সময় নিজের অভিজাত বংশের পরিচয় তুলে ধরা মোটেই অসমীচীন নয়। এতে শ্রোতার মনে দাওয়াতের প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইউসুফ (আঃ) সেকারণ নিজের নবী বংশের পরিচয় শুরুতেই তুলে ধরেছেন’ (ইউসুফ ১২/৩৮)।

(৩) শ্রোতার সম্মুখে অনেক সময় নিজের কোন বাস্তব কৃতিত্ব তুলে ধরাও আবশ্যিক হয়। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে নিজের আরেকটি মু‘জেযার কথা বর্ণনা করেন যে, কয়েদীদের খানা আসার আগেই আমি তার প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও আসার সঠিক সময় বলে দিতে পারি (ইউসুফ ১২/৩৭)।

(৪) নিজেকে কোনরূপ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিংবা ভবিষ্যদ্বক্তা বলে পেশ করা যাবে না। সেকারণ ইউসুফ সাথে সাথে বলে দিয়েছিলেন যে, ‘এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে দান করেছেন’ (ইউসুফ ১২/৩৭)।

(৫) প্রশ্নের জওয়াব দানের পূর্বে প্রশ্নকারীর মন-মানসিকতাকে আল্লাহমুখী করে নেওয়া আবশ্যিক। সেকারণ ইউসুফ তাঁর মুশরিক কারাসঙ্গীদের জওয়াব দানের পূর্বে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন (১২/৩৯)।

ইউসুফের দাওয়াতে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

(৬) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতার মস্তিষ্ক যাচাই করে দাওয়াত দেওয়া একটি উত্তম পদ্ধতি। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) তাঁর কারা সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী একক উপাস্য ভাল’? (ইউসুফ ১২/৩৯)।

(৭) শিরকের অসারতা হাতেনাতে ধরিয়ে দিয়ে মুশরিককে প্রথমেই লা-জওয়াব করে দেওয়া আবশ্যিক। সে কারণে ইউসুফ (আঃ) বললেন, তোমরা আল্লাহ্ কে ছেড়ে নিছক কিছু নামের পূজা কর মাত্র। এদের পূজা করার জন্য আল্লাহ কোন আদেশ প্রেরণ করেননি’ (ইউসুফ ১২/৪০)।

(৮) তাওহীদের মূল কথা সংক্ষেপে বা এক কথায় পেশ করা আবশ্যিক, যাতে শ্রোতার মগয সহজে সেটা ধারণ করতে পারে। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) সোজাসুজি এক কথায় বলে দিলেন, ‘আল্লাহ ছাড়া কারু কোন বিধান নেই... এবং এটাই সরল পথ’ (ইউসুফ ১২/৪০)।

(৯) বিপদ হ’তে মুক্তি কামনা করা ও সেজন্য চেষ্টা করা আল্লাহর উপরে তাওয়াঙ্কুলের পরিপন্থী নয়। সেজন্য ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে মুক্তি চেয়েছেন এবং নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যে কারাগারে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হচ্ছে, সে বিষয়টি বাদশাহর কাছে তুলে ধরার জন্য মুক্তিকামী কারা সাথীকে বলে দিলেন (ইউসুফ ১২/৪২)।

(১০) বান্দা চেষ্টা করার মালিক। কিন্তু অবশেষে তারুদীর জয়লাভ করে। সে কারণে ইউসুফের মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বন্ধু বাদশাহর কাছে তার কথা বলতে ভুলে গেল এবং কয়েক বছর তাকে কয়েদখানায় থাকতে হ’ল। কুরআনে **شبع سنين** শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে (ইউসুফ ১২/৪২)। যা দ্বারা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝানো হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ তাঁর কারাজীবনের মেয়াদ সাত বছর বলেছেন। এভাবে অবশেষে তারুদীর বিজয়ী হ’ল। কারণ আল্লাহর মঙ্গল ইচ্ছা বান্দা বুঝতে পারেনা।





جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

jazakumullah khairan